ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব

একক ১৭ ❐ রসবাদ, ধ্বনিবাদ ও বক্রোক্তিবাদ

গঠন

১৭.১ প্রস্তাবনা ঃ রসবাদ
১৭.২ রসবাদ
১৭.৩ সারাংশ
১৭.৪ অনুশীলনী-১
১৭.৫ প্রস্তাবনা ঃ ধ্বনিবাদ
১৭.৬ ধ্বনিবাদ
১৭.৭ সারাংশ
১৭.৮ অনুশীলনী-২
১৭.৯ প্রস্তাবনা-বক্রোক্তিবাদ
১৭.১০ বক্রোক্তিবাদ
১৭.১১ সারাংশ
১৭.১২ অনুশীলনী-৩
১৭.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.১ প্রস্তাবনা ঃ রসবাদ

একদা প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্যের দেহ ও আত্মার স্বরূপ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। কাব্য সাহিত্যের দেহ কী ? আত্মাই বা কাকে বলে ? কাব্যের বাহ্যরূপটা যদি হয় দেহ তাহলে সেই কাব্যদেহ নির্মাণের একমাত্র উপাদান হল 'শব্দ' কিন্তু যে কোনো শব্দই বা অর্থহীন শব্দ পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে না। একালের য়ুরোপীয় রূপবাদী সাহিত্যরসজ্ঞগণ শব্দের অর্থবহ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের আলোচনা করেছেন। সুতরাং কাব্যদেহের স্বরূপ আলোচনায় শব্দ ও অর্থের, বহাচক ও বাচ্যের লীলাতত্ত্বই আলোচনা করতে হবে। সাহিত্য হল শব্দ ও অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন। শব্দার্থ দিয়ে গঠিত সাহিত্যের আত্মা কী—এই আলোচনায় অগ্রসর হয়ে আলঙ্কারিকেরা রসবাদ, ধ্বনিবাদ এবং বক্রোক্তিবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আপনারা এই এককটি পড়ে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। রস কী, সাহিত্য পাঠ করে পাঠক মনে রসের উৎপত্তি ঘটে কীভাবে, সাহিত্য পাঠের সার্থকতাই বা কোথায়, সাহিত্য আনন্দদায়ক কেন, ধ্বনিকাব্য কাকে বলে, বক্রোক্তির কাজ কী — ইত্যাদি সম্পর্কিত নানান ধারণা গড়ে উঠতে সাহায্য করবে এই এককটি।

১৭.২ রসবাদ

রসের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আচার্য ভরত প্রশ্ন তুলেছিলেন 'রস ঃ ইতি কঃ পদার্থ: ? প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন, 'উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ' অর্থাৎ তাই 'রস' যা আস্বাদ্য। এই রসের আস্বাদন ঘটে কীভাবে তা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে জানালেন ঃ 'বিভাবনুভাবব্যভিচারী সংযোগাদ্রমনিষ্ঠাত্তিঃ' অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যবভিচারীর সংযোগ থেকে রসনিষ্পত্তি ঘটে। আলোচ্য শ্লোকে তিনি স্থায়িভাবের কথা উল্লেখ না করলেও নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে স্থায়ীভাবই যে রসত্বপ্রাপ্ত হয় সে কথা ঘোষণা করলেন একাধিকবার। ভরতের মতে, স্থায়ীভাবের সংখ্যা আট এবং শাম নামক স্থায়ীভাবকে স্বীকার করলে তার সংখ্যা দাঁড়ায় নয়। যতগুলি ভাব ততগুলিই রস, সুতরাং রসের সংখ্যাও দাঁড়াবে আটটি বা নয়টি। ভাব ও রসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; এই, সম্পর্ক বোঝাতে ভরত লিখেছেন—'ন ভাবহীনোহস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ/পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরণয়োঃ রসভাবয়োঃ'। অভিনবগুপ্তাচার্য ভাব বলতে বুঝিয়েছেন 'স্থায়ীভাব' ও 'ব্যাভিচারী ভাবকে'। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদুটি ভাবই রসের অন্তরঙ্গা উপাদান এবং বিভাব ও অনুভাব হল রসের বহিরঙ্গা উপাদান। রসের এই অন্তরঙ্গা উপাদান দুটি অর্থাৎ 'স্থায়ীভাব' ও 'ব্যাভিচারী' ভাব দুইই পাঠক বা দর্শকের অন্তরে বিরাজ করে। এই ভাবদুটিকে পুষ্ট হতে সাহায্য করে বিভাব ও অনুভাব। সুতরাং 'রস' যদি হয় আস্বাদ্য তাহ'লে বুঝতে হবে পাঠক বা দর্শকের অন্তরস্থ স্থায়ীভাবই তাঁর কাছে হয়ে উঠবে আস্বাদ্য। এমন কোনো রসের অনুভূতিই ঘটতে পারে না যা গড়ে তোলার জন্য স্থায়িভাব নেই।

ভরতাচার্য শৃঙ্গারাদি মোট আটটি 'রস'-এর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আবার শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎস—এই চারটিকে মূল রস বলে মনে করেছেন। অভিনবগুপ্ত মনে করেন, ধর্মার্থকামমোক্ষ এই চতুর্বর্গের সঙ্গে চারটি রস যুক্ত—'যে চাত্রোৎপত্তি-হেতব উক্তাস্তে যথা স্বয়ং (যথাবং) পুরুষার্থ চতুষ্কব্যাপ্তাঃ'। তবে রসের সংখ্যা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত রস সম্পর্কে বহুবচন এবং কখনো একবচন প্রয়োগ করেছেন। ষোড়শ শতকে কবি কর্ণপুর গোস্বামী বলেন, রজঃ এবং তমোগুণ বিনির্মুক্ত একমাত্র সত্ত্বগুণের দ্বারা গঠিত রসানুভূতি 'এক'। বিভাবাদির বিভিন্নতার জন্যই এক রসের বিভিন্ন অভিধা। 'অলঙ্কার কৌস্তভ'-এর ৫ম কিরণে কবিকর্ণপুর লিখেছেন—'রসস্য আনন্দধর্মত্বাৎ একত্বম, ভাব এবহি।' আলঙ্কারিক ভোজরাজ আটটি নয়, চারটি রসের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে চারটি রস হল—শান্তু, প্রেয়স, উদাত্ত এবং উদ্ধত। অনুরূপভাবে ব্যাভিচারীর সংখ্যা নিয়েও মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ভরত রসের কথা উত্থাপন করেছিলেন নাটক প্রসঙ্গে। সেই নাট্যরসই কালক্রমে কাব্যরসরূপে গৃহীত হয়েছে। তবে ভরতের রস নিষ্পত্তির সূত্র নিয়ে পরবর্তী আলঙ্কারিকেরা সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছিলেন। ভরতের সূত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর রস সম্পর্কে চারটি মতবাদ গড়ে তুলেছেন। এইগুলি হল ঃ

১। ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

২। ভট্টশাঙ্কুরের অনুমিতিবাদ

৩। ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

৪। অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

ভট্টলোল্লট উৎপত্তিবাদী হিসেবে পরিচিত। লোল্লটের মতে, নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ রস নট-নটীতে আরোপিত হয় মাত্র। এ অনেকটা রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো। লোল্লট মনে করতেন, যে অসত্য অনুভূতি দর্শক বা পাঠকের মধ্যে জাগে তা আনন্দদায়ক। রসের উৎপত্তি ব্যাপারটি তাঁর মতে, নায়িকা-নায়িকাগত। সুতরাং রসের উৎপত্তি হয় এবং তা হয় নায়ক-নায়িকার মধ্যে ; দর্শক বা পাঠক সেই রসকে আরোপ করে নট-নটীতে। এই মতানুসারে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার উভয়ের মধ্যে যে শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি হয়, দর্শকরা নট-নটীতে প্রত্যক্ষ করার সময় সেই রস নট-নটীতে আরোপ করে থাকেন।

লোল্লটের এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করেন অনুমিতিবাদী ভট্টশঙ্কুক। তিনি বললেন, রসের উৎপত্তি ঘটে অনুমান থেকে। কুয়াশা-দ্বারা ব্যাপ্ত দেশে অবিদ্যমান ধূমের মিথ্যা অনুমান থেকে যেমন ধূমযুক্ত বহ্নির অনুমান হয়, সেইরকম নিপুণ নট-নটী যখন অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা অবিদ্যমান দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে প্রকাশ করে তখন দর্শকের মধ্যে নট-নটীতে দুষ্মন্ত্যাদি—গত রতির অনুমান হয়। সেই অনুমান থেকেই দর্শক তথা 'সামাজিকের' হৃদয়ে রসের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই যে অনুমান, কার স্বরূপ কী ? শঙ্কুক বললেন, চিত্রার্পিত অশ্বকে যেমন দর্শক অশ্বজ্ঞান করে এই অনুমানও সেইরকম। চিত্রার্পিত অশ্বকে দেখে দর্শকের মধ্যে সম্যক, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য—এই চারটি জ্ঞানের কোনোটিই হয় না। সুতরাং শঙ্কুকের সিদ্ধান্ত হল, চিত্রার্পিত অশ্বে অশ্বের অনুমান হয় বলে, তা আনন্দদায়ক। সেই রকম নট-নটীতে নায়ক-নায়িকার অনুমানের দ্বারা দর্শকেরা আনন্দ বা রস অনুভব করেন।

অতঃপর এলেন ভট্টনায়ক। ভুক্তিবাদী ভট্টনায়ক পাত্র-পাত্রীর মধ্যে রসোৎপত্তি, নট-নটীতে নায়ক-নায়িকার অনুমান হেতু রসের অনুমান কোনোটিই মানলেন না। তিনি নাট্যদর্শন বা কাব্যপাঠকালে দুটি ক্রিয়ার উদ্ভবের কথা বলেছেন—ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব। প্রথমটির দ্বারা 'সহৃদয়ে'র তটস্থতা দূর হয়। নায়ক-নায়িকা যে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সর্বসময়ের ও সর্বকালের তা বোঝা যায় 'ভাবকত্ব' ক্রিয়াটির দ্বারা। ভাবকত্ত্বের কাজ দুটি সাধারণীকরণ এবং পার্থিব চিন্তাধারায় ভার থেকে মুক্ত করে চিত্তে তন্ময়তা-সৃষ্টি করা। ভট্টনায়কের মতে, অতঃপর ভোজকত্ব ব্যাপার দ্বারা ললনা বিষয়ক রতি 'সামাজিক' গণ উপভোগ করেন এবং ওই প্রকার রতির উপভোগ থেকেই রসের নিষ্পত্তি ঘটে।

অভিব্যক্তিবাদী অভিনব গুপ্ত ভাবকত্ব বৃত্তিটি স্বীকার করলেও ভোজকত্বরূপ বৃত্তিটি স্বীকার করলেন না। তিনি মনে করেন, ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই রসোপলব্ধি ঘটে থাকে। ফলে ভোজকত্ব রূপ বৃত্তিটির কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। ভট্টনায়কের মত, অভিনব গুপ্তও স্বীকার করেছেন যে, সহৃদয় রসিক ও দর্শকের ব্যক্তিগত জীবনে যে ভাবনাস্রোত বল তা কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনকালে সাময়িকভাবে থেমে যায়। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বোধ যা রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে বিঘ্নকারক, বাক্যপাঠকালে সেই বিঘ্ন দূর হয়। যতক্ষণ ব্যক্তিগত চিন্তা চৈতন্যকে আবৃত করে রাখে ততক্ষণ রসাস্বাদ সম্ভব নয়। অভিনব গুপ্ত সাতরকম বিঘ্নের কথা উল্লেখ করেছেন—প্রতিপত্তি বিষয়ে অযোগ্যতা, স্বগত বা পরগতভাবে দেশ-কালের অনুভব, নিজের সুখ ও দুঃখ বোধের দ্বারা বিবশভাব, প্রতীতির উপায়ে বৈকল্য, অস্পষ্টতা, অপ্রধানতা ও সংশায়িত প্রতীতি। এইসব রজঃ ও তমোগুণই রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ। সুতরাং রজঃ এবং তমোগুণ বিনির্মুক্ত হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হলে তাই রসের আস্বাদ সম্ভব। সত্ত্বগুণে চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থির হয়। চিত্রের এই স্থিতিই হল, অভিনবগুপ্তাচার্যের ভাষায় 'চিত্তবিশ্রান্তি'। অভিনব গুপ্ত জানেন, মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে অহং-মুক্ত স্থির চিত্ত সর্বদা থাকে না। ফলে

কাব্য-নাট্যপাঠ বা দর্শনকালে যখন সেই বিশ্রান্তচিত্তে 'স্ব-সংবিদানন্দ চর্বণ-ব্যাপার' সম্ভব হয়, তখনই রসাস্বাদ ঘটে। এই রসের আস্বাদক নায়ক-নায়িকা বা নট-নটীতে নয়। নট-নটী যদি রসের আস্বাদে সক্ষম হয় তবে তাঁরা তা আস্বাদ করেন সাধারণ দর্শকের ভূমিকা থেকে। সুতরাং রস অনুভব একমতার্ দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। এই দর্শক বা পাঠককেই বলা হয় 'সহৃদয় সামাজিক'। অভিনব গুপ্ত বলছেন—'যেধাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভাবনযোগ্যতা তেহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কাব্যচর্চায় স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মনোমুকুরের অধিকারীই সেই পাঠক, যার অন্তরে রসের অভিব্যক্তি ঘটে। তাহলে বোঝা গেল যে, অভিনবগুপ্ত রসের উৎপত্তি বা অনুমানে বিশ্বাসী নন, বিশ্বাসী নন এই মতেও যে, নায়ক-নায়িকা রসের আশ্রয়। তাঁর মতে হ'ল, রসের প্রতীতি ঘটে পাঠক বা দর্শক হৃদয়ে। এই পাঠক বা দর্শক ধ্বনিকারের ভাষায় 'কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞ'।

ভারতের পর ভামহ এবং দণ্ডী 'রস' সম্পর্কে ততটা গুরুত্ব দেননি। ভামহ বলেছিলেন 'সৈবা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন অলঙ্কারের উপর এবং রসবৎ অলঙ্কার রূপে রসের মাহাত্ম্য স্বীকার করেছিলেন। দণ্ডীও তাঁর 'কাব্যাদর্শে', রস-কে মাধ্র্যগুণের অন্তর্গত করেছিলেন। দণ্ডী রসবাদীদের পন্থায় রসের স্বরূপ আলোচনা করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহাকাব্যে ভাব এবং রস দুই থাকবেই। বিশ্বানাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণ'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে রসের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, রস হ'ল বেদান্তর সম্পর্কশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, স্বপ্রকাশ অখণ্ড চিন্ময়ানন্দ, এবং লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ। বেদান্তর সম্পর্কশূন্য কথার অর্থহল, রসের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কোন সম্বন্ধ নেই। রজঃ গুণগত কামনা-বাসনা, তমঃ গুণজাত দুঃখ-মোহ প্রভৃতি দূর হয়ে চিত্তে সত্ত্ব গুণের আবির্ভাব হয় ; এই অবস্থায় বাহ্যবস্তু বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। এইভাবে বেদান্তর-সম্পর্কশূন্যতা সৃষ্টি হয়। আর 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' কথার অর্থ হ'ল, ব্রহ্মানুভূতির সময়ে যেমন অপর কোন বস্তুর জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি, রসানুভূতির সময়ে বিষয়ান্তরের জ্ঞান থাকে না। তবে এখানে 'সহোদর' শব্দটির দ্বারা 'ব্রহ্মবাদ' ও 'কাব্যস্বাদে'র মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়েছে। 'সহোদর' শব্দটির অর্থ হল 'মতো'। অর্থাৎ কাব্য ব্রহ্মের মতো অবাঙ্মনসগোচর নয়, তার 'রূপ' আছে। 'স্বপ্রকাশ' কথার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, অন্য কোনো জ্ঞানের দ্বারা রসানুভূতি হয় না। রসোৎপত্তির কারণেই রসের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ বিশ্বনাথ বলছেন যে, অলৌকিক কাব্যের পর্যালোচনায় যে অনির্বাচনীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে চিত্তের বিস্তার করে, সেই বিস্তার রূপ উদারতাই চমৎকার পদার্থ। ওই চমৎকার পদার্থই রসের প্রাণ। সুতরাং কাব্যরসিকের মানসিক উদারতার কারণ যদি হয় রস, তাহলে সেই রসকে বলা হয় 'চিত্তাবিস্তারক'।

রসবাদীদের মতে, রস হল 'লোকোত্তর-চমৎকার প্রাণ।' লোকোত্তর চমৎকারিত্বই কাব্য বা নাটক থেকে অনুভূত হয়, যেহেতু কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনের মুহূর্তে পাঠক বা দর্শক ব্যক্তিগত লাভক্ষতির ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ পাঠক বা দর্শক অনুভব করেন ও ঘটনা তাঁর ব্যক্তিজীবনের নয় অথচ তাঁর জীবনেও এঘটনা ঘটা সম্ভব ; আবার এই ঘটনা অপরের এবং সম্পূর্ণ অপরেরও নয়। একই সঙ্গে এই বিপরীত ধরনের অনুভূতি বাস্তবে সম্ভব নয়, কিন্তু বাস্তবের অসম্ভব ঘটনাই কাব্যে সম্ভব হয় বলেই কাব্যের বা রসের জগৎ লোকোত্তর আনন্দের জগৎ। লৌকিক আনন্দে ব্যক্তিগত স্বার্থজড়িত থাকে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে যেহেতু বাস্তব প্রয়োজন ও জীবনের প্রাত্যহিক উপলব্ধির কোনো স্থান থাকে না তাই তো অলৌকিক। ভাষাসাহিত্য পাঠকালে পাঠকের সঙ্গে সাহিত্য-বর্জিত বিষয়বস্তুর একাত্মতা ঘটে থাকে। রসবাদীরা মনে করেন, এই একাত্মতাই শিল্পজ

আনন্দের কারণ। ভারতীয় আলঙ্কারিকের একেই বলেছিলেন 'সাধারণীকরণ'। এই 'সাধারণীকরণ' কী? 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন, 'ব্যাপারোহস্তি বিভাবার্দেনাত্মা সাধারণী কৃতিঃ', 'প্রমাতা তদভেদেন সাত্মানং প্রতিপদ্যতে' অর্থাৎ বিভব প্রভৃতি সাধারণীকৃতি—রূপ ব্যাপারের ফলে সহৃদয় বিভাবাদির সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বোধ করেন। এই 'সহৃদয়' কাব্যাদিগত 'বিভব' ইত্যাদি এমন এক ঐক্য লাভ করে, যার ফলে সহৃদয়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে কিন্তু থাকে না। এই সাধারণীকৃতি নামক ব্যাপার থেকে আত্মাতে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভেদজ্ঞান হয় এবং সেই অভেদজ্ঞান থেকেই সামাজিকের নায়কাদি বিষয়ে রত্যাদির উদয় হয়। এই সাধারণীস্কৃতির দ্বারাই যে বস্তু জগতে অনিত্য, কাব্যজগতে তাই হ'য়ে ওঠে নিত্য এবং শ্বাশ্বত। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যে 'সাধারণীকরণের' কথা বলেছেন, কান্ট তাকেই বলেছেন 'Subjective Universality'।

রস আনন্দদায়ক ; তাই দুঃখের কাব্য-নাটক থেকে আমরা দুঃখ নয়, আনন্দই লাভ করে থাকি। এ নিয়ে অ্যারিস্টটল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, 'ভীতি' ও 'করুণা'র মিশ্রণে ক্যাথারসিস ঘটে এবং ট্রাজিকপ্লেজার লাভ হয়। অনেকে মনে করেন, 'দুঃখ ও আনন্দের মধ্যে হেতুগত কোন পার্থক্য নেই।' শেলীর মতে, 'তীব্রতম দুঃখই মহত্তম আনন্দের কারণ'। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সাহিত্যিকের কাজ 'সত্য' কে নিয়ে এবং এই সত্য সাহিত্যে রূপায়িত হয় বলেই সাহিত্য আনন্দদায়ক। তিনি আরও বলেছেন, 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক'। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা রসের ব্যাখ্যায় যে ধরনের অনুভূতির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'ট্রাজেডির আনন্দ' ব্যাখ্যা অনেকটা যেন সেই জাতীয় বলেই মনে হয়। সুতরাং সকলেই একথা মেনেছেন যে, সাহিত্য হ'ল আনন্দদায়ক এক রূপনির্মিতি।

১৭.৩ সারাংশ

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের প্রসঙ্গ বহু প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভরত থেকে শুরু করে সকলেই রস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে ভরতের পর রসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অভিনব গুপ্ত। বিশ্বনাথ কবিরাজ একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, কাব্যপাঠের ফলে রজঃ এবং তমোগুণের বিলোপ হয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। সেই অবস্থায় রস অনন্তমূর্তিতে পাঠকের মনে আনন্দরূপে অন্যস্থান রহিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সরাস্বাদ, তাঁর মতে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তুল্য। অনুরূপভাবে কাব্যরসের আস্বাদনজাত আনন্দ একমাত্র কাব্যপাঠকের কাছেই সত্য হয়ে ওঠে। কাব্যপাঠকই যেহেতু কাব্যের একমাত্র আস্বাদক ও বিচারক, সেজন্য রসাস্বাদনকে ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবে পার্থক্য এইখানে যে, কাব্য, ব্রহ্মের মতো বাক্ ও মনের অগোচর নয়, কাব্য হল বাণী-শিল্প। শব্দকে আশ্রেয় করে তার বোঝ জন্মে। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা এইভাবে কাব্যপাঠজাত আনন্দকে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারজাত আনন্দের সুঙ্গে তুলনা করে কাব্যানন্দকে অলৌকিক বলে চিহ্নিত করেছেন।

১৭.৪ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ও আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

১। ভরতের গ্রন্থটির নাম কী? রস সম্পর্কে তিনি ওই গ্রন্থের কোন্ অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

২। ভরতছাড়া আরো দুজন রসবাদীর নাম করুন।

৩। 'রস' সম্পর্কে যে চারটি মতবাদ পাওয়া যায় সেগুলি কী কী ? সেই মতবাদের প্রবক্তাদের নাম করুন।

৪। রসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কে দিয়েছেন ? তাঁর সেই মতবাদ কী নামে পরিচিত।

৫। অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদটি আলোচনা করুন।

৬। 'রস' আনন্দদায়ক কেন ?

৭। 'রস' ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা অলৌকিক বলেছেন কেন ?

৮। 'সাধারণীকরণ' ব্যাপারটি কী ?—বুঝিয়ে বলুন।

৯। 'রস' কে 'ব্রহ্মাস্বাদঃ সহোদর' কেন বলা হয়েছে—ব্যাখ্যা করুন।

১০। আলঙ্কারিকেরা বলেন রস হল, 'লোকোত্তরচমৎকার প্রাণ'—এ কথার অর্থ কী ?

১১। 'কাবার্থতত্ত্বজও' কে ?

১২। 'রস' কী—এ সম্পর্কে একটা অনুচ্ছেদ লিখুন।

১৭.৫ প্রস্তাবনা ঃ ধ্বনিবাদ

সাধারণ ভাষা কাব্যভাষার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাষা কোনোভাবে বুঝিয়ে বললেই চলে কিন্তু কাব্যভাষাকে সাদা-মাটা হলে চলে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় আভাস ও ইঙ্গিতের। কাব্য ভাষার এই অসামান্যতার কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের প্রতীকী তাৎপর্যে মুগ্ধ হয়ে একদল তরুণ কবি লন্ডনের সোহো জেলার অন্তর্গত একটি রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়ে imagist Group গঠন করেছিলেন। মহিলা কবি এমি লোয়েল, এজরা পাউন্ড, এলিয়ট প্রমুখ ছিলেন এই গ্রুপে। এঁরা ঠিক করেছিলেন, একটি মাত্র সার্থক প্রতীক সৃষ্টি করা একটি মহাকাব্য রচনার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কাব্য ভাষা সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের কবি সাহিত্যিকেরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছিলেন। কিন্তু এরও পূর্বে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের একটি ছক, যাঁরা ধ্বনিবাদী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা কাব্যভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব মন্তব্য করেছিলেন। এই এককটিতে কাব্যভাষা সম্পর্কে ধ্বনিবাদীদের সেই আলোচনাকে তুলে ধরা হল।

১৭.৬ ধ্বনিবাদ

কাব্যের রসস্বাদনে কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে ধ্বনিবাদের কথা আধুনিক কালে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দুটি করে অর্থ থাকে—বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। বাচ্যার্থ হল বাচক শব্দের আভিধানিক অর্থ। বাচ্যার্থ ছাড়া কাব্যের ক্ষেত্রে প্রধান রূপে গণ্য হয় সেইটি হয় ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি অথবা প্রতীয়মান অর্থ। কবি যখন বলেন—

'মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া—'তখন পদটির সৌন্দর্য শুধুমাত্র তার বাচ্যার্থ বা অভিধা অর্থের ওপর নির্ভর করে না।

চতুর্দিকে বর্ষণমুখর প্রকৃতির মধ্যে প্রিয় বিরহে কাতর এক নারীর যে হৃদয়ের বেদনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা দেখতে পাই শ্রেষ্ঠকাব্য তার বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে বিয়াস্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকরো এই বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনি হচ্ছে কাব্যের আত্মা। ধ্বনিবাদী আনন্দধ্বনি এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

তবে ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনের পূর্বে ধ্বনি সম্পর্কে আরো তিনটি মত প্রচলিত ছিল—

১) ধ্বনি বলে কিছু নেই।

২) ধ্বনি মানে হল লক্ষণা।

৩) ধ্বনি হল অনিবার্চনীয়।

এই তিনটি বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করে আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ধ্বনির মাহাত্ম্য স্বীকারে যাঁরা সম্মত নন, তাঁরা মনে করেন অলংকার এবং গুণ থাকাই যেখানে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বলাভের উপায়, সেখানে ধ্বনির প্রয়োজন থাকতে পারে না। দ্বিতীয় দল মনে করেন, কাব্যপাঠকালে অভিধাশক্তির দ্বারা যা বোঝায় সেই মুখ্যার্থের বাধা থাকলে মুখ্যার্থের সঙ্গে যুক্ত অপর অর্থ যে শক্তির দ্বারা বোঝা যায় সেই লক্ষণা শক্তি হল ধ্বনিরই নামান্তর। এই লক্ষণাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—প্রয়োজনমূলা ও বারিমূলা। প্রয়োজনমূলার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—অর্থাৎ ঘোষেরা গঙ্গায় থাকে। এখানে 'গঙ্গায়' বলতে গঙ্গার তীর বোঝায় কিন্তু 'গঙ্গায় বাস' বললে গঙ্গার শীতলতা এবং পবিত্রতার বোঝ জন্মে। এই 'শীতত্ব' ও 'পাবনত্বে'র বোধকেই আলঙ্কারিকেরা 'প্রয়োজন' আখ্যা দেওয়ায় উদাহরণটি 'প্রয়োজনমূলা লক্ষণা'র। কিন্তু যদি বলা হয় 'কলিঙ্গা সাহসিকঃ' তাহলে কলিঙ্গা বলতে কলিঙ্গাদেশ নয়, 'কলিঙ্গাদেশবাসী'কে বুঝতে হবে। এখানে যেহেতু আধেয় বোঝাতে আধার ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এক 'রাঢ়িমূলা' লক্ষণা বলে। 'ধ্বনিকে' যাঁরা লক্ষণা বলে মনে করেন, তাঁদের যুক্তি হ'ল, যেহেতু লক্ষণার মধ্যে মুখ্য অর্থ বাধিত হচ্ছে তাই 'ধ্বনি' লক্ষণা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ধ্বনিকার একথা মানতে সম্মত নন। কারণ লক্ষণায় গৌণার্থ প্রধান হলেও বাচ্যার্থের সঙ্গে তার যোগ আছে। তাই গৌণার্থটি অভিধা অর্থের সঙ্গে যুক্ত, তা বেশিদূর ছাড়িয়ে যায়নি। অন্যদিকে ধ্বনির কাজ হল বাচ্যার্থকে কেন্দ্র করে তাকে বহুদূর ছাড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং লক্ষণা ও 'ধ্বনি' এক নয়।

ধ্বনিবাদের তৃতীয় প্রতিপক্ষ হল অনিবর্চনীয়বাদী। এঁদের মতে, ধ্বনি কী তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তা সহৃদয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামাত্র। অতএব ধ্বনি অনির্বচনীয়। অভিনব গুপ্তচার্য এই তিন বিরূপ মতবাদীদের সম্পর্কে বলেছেন, প্রথমদল ধ্বনির স্বরূপ জানেন না। দ্বিতীয় দল সংশয়ী এবং তৃতীয় দল অজ্ঞতবশে ধ্বনির সংজ্ঞাদানে বিরত হলেও ধ্বনির অস্তিত্বে তারা বিশ্বাসী। —এই তিনটি বিরুদ্ধমতকে খণ্ডন করার পর আনন্দ বর্ধন ক্রমে ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন।

'ধন্যালোক'-এর প্রথম উদ্দ্যোতে ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই ধ্বনিকার বললেন, কাব্যের সেই অর্থ বা সহৃদয়ের কাছে প্রীতিপ্রদ তা দু'ভাগে বিভক্ত—বাচ্য এবং প্রতীয়মান অর্থ। বাচ্য অর্থ আভিধানিক, এবং দীর্ঘকাল ধরে শব্দার্থবাদী ও রীতিবাদীরা এই বাচ্যার্থের রমণীয়তা সৃষ্টির কথাই বলে গেছেন নানাভাবে। কিন্তু আনন্দবর্ধন যে ব্যঙ্গার্থের কথা বলেছেন তা অলংকার যোগ বা বিয়োগের দ্বারা বর্ধিত বা বিনষ্ট হয় না। এই ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান অর্থের সার্থক উপমা তাঁর মতে রমণীদেহের লাবণ্য—

'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বাস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।

যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু।।'

এই লাবণ্যসদৃশ প্রতীয়মানার্থের জন্যই ক্রৌঞ্চিদ্বয়ের একের বিয়োগে অপরের বেদনা আদি কবির মনে উপজাত শোককে শ্লোকে পরিণত করেছিল। সুতরাং প্রতীয়মানার্থই 'ভাব' থেকে 'রস' সৃষ্টির উপায়। কিন্তু ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন সহৃদয়ের আস্বাদ্য যে অর্থের কথা বলেছিলেন তার প্রথমটি হল বাচ্যার্থ। সুতরাং তিনি যে বাচ্যার্থকে অস্বীকার করছেন না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি প্রতীয়মানার্থই সহৃদয়ের প্রীতি উৎপাদনে সক্ষমতার জন্য কাব্যের আত্মা বলে উল্লিখিত হয় তাহলে আর বাচ্যার্থের প্রয়োজন আছে কি ? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ধ্বনিকার একটি খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বললেন—আলোকার্থী যেমন দীপশিখার প্রতি যত্নবান হন সেই রকম ব্যঙ্গার্থের জন্য প্রয়োজন হয় বাচ্যার্থ বোধের। অর্থাৎ দীপশিখার কাজ দীপশিখাতেই সমাপ্ত নয়, কোন বস্তুকে উদ্‌ভাসিত করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। সুতরাং দীপশিখা এখানে 'ব্যঞ্জক' আর উদ্‌ভাসিতকে 'ব্যঙ্গ্য' বলতে হবে। অনুরূপভাবে যিনি কাব্যের অর্থ উপলব্ধি করতে চান তাকে প্রথমে বাচ্যার্থ বুঝতে হবে, তারপর ব্যঙ্গার্থ—এই 'ব্যাঙ্গার্থই' হল তার অনুসঙ্গোয়। বাচ্যার্থ যে ব্যঙ্গ্যার্থ বোধের সঙ্গো অপরিহার্য সম্পর্কে বদ্ধ আনন্দবর্ধন সেকথা জানিয়ে সহৃদয়ের কাছে বাচ্যার্থ যে আগ্রহসৃষ্টিক্ষম সেকথা বুঝিয়ে দিলেন। সুতরাং এই ব্যঙ্গার্থই আনন্দবর্ধনের মতে কাব্যার্থ। তিনি আরও বললেন, শব্দার্থের বোধ থাকলেই চলবে না কাব্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কাব্যার্থের বোধ। এই ব্যঞ্জিত অর্থের মাহাত্ম্য পাশ্চাত্ত্য আলংকারিকেরাও নানাভাবে কীর্তন করেছেন। এই ব্যঙ্গার্থই হচ্ছে 'ধ্বনি'। যেহেতু এই ধ্বনি রসসৃষ্টিতে সক্ষম তাই আলংকারিকেরা একে বলেছেন 'রসধ্বনি'।

মহাকবি কালিদাস পার্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গো যখন বলেন—

'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী

লীলাকমলপত্রানি গণয়ামাস পার্বতী।।' তখন লীলাকমের পত্রগণনার দ্বারা পার্বতীর পূর্বরাগের লজ্জাকে অসামান্যকৌশলে ব্যঞ্জিত করেন। এখানে বাচ্যার্থকে ছড়িয়ে অর্থটি সুদূরে পৌঁছে দেয় পাঠককে। তাই এটি একটি উৎকৃষ্ট কাব্য হয়েছে! কিন্তু এই একই বিষয় নিয়ে কবি যখন লেখেন 'কৃত বরকথালাপে কুমার্যঃ পলকদগমৈঃ .....' তখন তা মহাকাব্যপদবীতে উন্নীত হতে পারে না। কারণ এখানে বাচ্যার্থই মুখ্য, ব্যঙ্গার্থ নয়। তাই কালিদাসের উক্ত শ্লোকটিকে আমরা বলব ধ্বনি। এই ধ্বনিই পাঠকের অন্তরে রসের সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং কেবল ধ্বনি নয়, রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

বিশ শতকে এই ব্যঞ্জিত অর্থের মাহাত্ম্য পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা কীর্তন করেছেন নানাভাবে। ব্রাডলে বলেছিলেন, যে কোনো কবিতার চতুর্দিকে বিরাজ করে এক অসীম ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গার্থের জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে' আপাত অস্বাভাবিকতা সত্ত্বেও পাঠকের কাছে আস্বাদনীয় হয়েছে। সুতরাং ব্যঞ্জনা বা Suggested sense-এর ভূমিকা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের কবি-নব্য সমালোচকেরা সেই সত্যকে স্বীকার করেছেন।

আনন্দবর্ধন ব্যঙ্গার্থে বা প্রতীয়মান অর্থের ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি অলংকারকে প্রাধান্য

না দিলেও অলংকার ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে, ব্যঙ্গার্থ-বিশিষ্ট কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গা, বর্ণনা, অলংকার প্রভৃতির তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে তাকে কী কাব্য বলা যাবে ? এই প্রসঙ্গে তিনি 'গুণীভূত ব্যঙ্গা, কাব্যের আলোচনা করলেন বৈন্যালোকরে তৃতীয় উদ্দ্যোতে। ধ্বনিকার বললেন, রমণীর লাবণ্যসদৃশ যে ব্যঙ্গা অর্থ প্রতিপাদন করা হয় তার প্রাধান্য ঘটলে তা ধ্বনিবাদবাচ্য হয়। কিন্তু ব্যঙ্গা অর্থ গৌণ হয়ে বাচ্যার্থ রমণীয় ও সুপ্রকট হয়ে উঠলে ব্যঙ্গা গুণীভূত হওয়া কাব্যটিকে গুণীভূত ব্যাঙ্গাকাব্য বলা হয়। সুতরাং তা কাব্য নয়, কাব্যের অনুকরণ মাত্র। এইভাবে তিনি ধ্বনিকাব্যকে শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে গণ্য করে বিপরীত দিকে আর দুই শ্রেণির কাব্যের কথা বললেন আনন্দবর্ধন গুণীভূতব্যাঙ্গাকাব্য ও চিত্রকাব্য। গুণীভূত ব্যঙ্গো বস্তুর বর্ণনা এবং অলংকারের দ্বারা ব্যঙ্গার্থ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আর চিত্রকাব্যে ব্যঙ্গার্থের কিছুমাত্র স্পর্ষ থাকে না। ব্যঙ্গ্যকাব্যই রসিকদের কাছে গ্রাহ্য।

১৭.৭ সারাংশ

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে 'ধ্বনির' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। দীর্ঘকাল পূর্বে ভারতীয় আলংকারিকদের একদল ধ্বনি সম্পর্কে অভিনব কিছু বক্তব্য রাখেন। এঁরাই ধ্বনিবাদী বলে পরিচিত। তাঁদের আলোচ্য তিনটি মতকে খণ্ডন করে পরবর্তীকালে আনন্দবর্ধন তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দুটি অর্থ থাকে বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ। বাচ্য অর্থ আভিধানিক এবং দীর্ঘকাল ধরে আলংকারিকের বাচ্যার্থের রমণীয়তা সৃষ্টির কথাই বলে আসছেন নানাভাবে। কিন্তু আনন্দবর্ধন মনে করেন, ব্যঙ্গার্থ বা প্রতীয়মান বিশিষ্ট কাব্যই শ্রেষ্ঠকাব্য। বিজ্ঞান, দর্শন, জ্ঞানের কথা বলে, কিন্তু কাব্য বহন করে ভাবের কথা। তাই তাকে প্রমাণ করলে চলে না, এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে তাকে সঞ্চারিত করে দিতে হয়। আর এই সঞ্চার কার্যটির জন্যই কাব্যের ভাষাকে, ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার' তখন তিনি যে শুধুই নৈসর্গিক জোয়ার ভাটার কথা বলেন না এ সত্য সহৃদয় বাকি মাত্রই জানেন। এই ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ। এ ব্যঞ্জনা না থাকলে 'কাব্য' কাব্যপদবীতে উন্নীত হতে পারে না। কবিরা সামান্য ক'টি কথার আঁচড়ে অসামান্য কিছু বক্তব্য পেশ করেন। এই সামান্য কথার ভিতরে যে নিহিতর্থাটি লুকিয়ে আছে সহৃদয় পাঠকের দায়িত্ব তাকেই উপলব্ধি করা। সুতরাং কাব্য এমন একটি বিশেষ art form যার সাহায্যে কবি নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে বলে যান এমন কিছু কথা যা হয়ে ওঠে অসামান্য ব্যঞ্জনা বা প্রতীয়মান অর্থ ছাড়া এই অসামান্যতা ফুটে ওঠা সম্ভব নয়। এই কারণেই আধুনিক সমালোচনা তত্ত্বে ধ্বনির গুরুত্ব অপরিসীম অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

১৭.৮ অনুশীলনী-২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

১। ধ্বনিবাদী আনন্দবর্ধনের গ্রন্থটির নাম কী ? ধ্বনি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার পরিচয় দিন।

২। আনন্দবর্ধনের পূর্বে ধ্বনি সম্পর্কে যে তিনটি মত ছিল সেগুলি কী কী ? মতগুলি আলোচনা করুন।

৩। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের কয়টি অর্থ আছে ? সেগুলি কী কী ? সেই অর্থ দুটির ব্যাখ্যা করে কাব্যের ক্ষেত্রে কোনোটি গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

৪। 'ধ্বনি' কী ? ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৫। কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে 'বাচ্যার্থ' এবং 'ব্যাঙ্গার্থ'—এই দুই এরই প্রয়োজন আছে কী ? থাকলে কেন তা বুঝিয়ে বলুন।

৬। শ্রেষ্ঠ কাব্য বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে — একথার অর্থ কী ?

৭। ধ্বনিকাব্য এবং গুণীভূত ব্যঙ্গাকাব্য কি এক ? যদি এক না হয় তাহলে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন ?

৮। 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা'—ধ্বনিবাদীদের এই মত কতদূর গ্রহণযোগ্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৯। আধুনিক সমালোচনাতত্ত্বে ধ্বনির গুরুত্ব অপরিসীম কেন ?

১৭.৯ প্রস্তাবনা ঃ বক্রোক্তিবাদ

রূপনির্ভর সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। যে সাহিত্য ভাষার মধ্যস্থতায় বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করেনি, তাকে কি সাহিত্য বলা যাবে ? নীরব কবিত্বকে স্বীকার করবেন না কেউই। বস্তুত রূপ নির্ভর কাব্য-সাহিত্যের মাধ্যমই হল ভাষা, তথা শব্দ। তেমনি সংগীতের মাধ্যম সুর ও কথা, চিত্রের মাধ্যম রং ও তুলি। যদিও শব্দটাই সাহিত্য নয়, তাই বাক্ এবং অর্থের সম্পর্ক নির্ধারণে মহাকবিরা 'পার্বতী পরমেশ্বরৌ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং শুধু শব্দ বলাই যথেষ্ট নয়, অর্থানুকূল শব্দের ব্যবহারেই কবির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব। অর্থযুক্ত শব্দের দ্বারা যে সাহিত্য গড়ে উঠলো, ছন্দ, অলংকার তার মহিমা বাড়িয়ে দেয়। —এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ বক্রোক্তি হল কাব্যের প্রাণ স্বরূপ। সাহিত্য যেহেতু ভাবের কথা বহন করে, এবং অপরের হৃদয়ে সেই ভাবকে সঞ্চারিত করে, সেইহেতু সহজ কথাকে সহজভাবে না বলে আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে হয়। এই বক্রোক্তি হচ্ছে কুন্তকের ভাষায় 'বৈদ্যগ্ধভঙ্গীভণিতিঃ'। সুতরাং যে কোনোরকম তীর্যক মন্তব্যই কবিতা নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য যেহেতু পাঠক হৃদয় সেইহেতু সাহিত্যের শব্দের চরম সিদ্ধি যেখানে, সেখানেই শব্দ পাঠকের হৃদয় জগৎকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

১৭.১০ বক্রোক্তিবাদ

কবির ভাষা যে উক্তি নয়, বক্রোক্তি কুন্তকাচার্য সে কথা তাঁর 'বক্রোক্তি জীবিতম্ গ্রন্থে আলোচনা করেছিলেন। কুন্তকের পূর্বে বক্রোক্তি ছিল মুখ্য শব্দালংকার। কিন্তু তিনি সাধারণ অলংকারকে 'অভিধা-প্রকার-বিশেষ' রূপে চিহ্নিত করে বক্রোক্তিকে কবি ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল বিশেষ ধরনের উক্তি বলে সাধারণ অলংকার থেকে পৃথক করে দিলেন। বক্রোক্তি ছিল একটি বিশেষ শব্দালংকার মাত্র। যারা শব্দালংকার রূপে বক্রোক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন তারা বক্রোক্তির দুটি বিভাগের কথা বলেছিলেন—'কাকু এবং শ্লেষ'। প্রথমটি নির্ভর করে উচ্চার ভঙ্গির উপর এবং দ্বিতীয়টিতে বাহ্য অর্থ ছাড়াও থাকে অন্য আর একটি অর্থ। কিন্তু

ভামহ বক্রোক্তিকে গুণ এবং অলংকার থেকে পৃথক করে নিলেন। তিনি অন্যান্য অলংকার প্রসঙ্গে আলোচনার পর অতিশয়োক্তির ক্ষেত্রে বললেন 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ' তাঁর সিদ্ধান্ত হল মহাকাব্য-নাটক-কথা সর্বত্রই বক্রোক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। অভিনব গুপ্ত বক্রোক্তি বলতে বুঝিয়েছেন 'লোকোত্তীর্ণেন রূপেশবস্থানম্'। কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিতম্'-এর তৃতীয় উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায় 'লোকাতিক্রান্ত গোচরা' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন 'প্রসিদ্ধা ব্যাপারাতীত' অর্থে। দণ্ডী স্বভাবোক্তি থেকে যাবতীয় অলংকারের পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন বক্রোক্তি কথাটির দ্বারা। দণ্ডীর মতে, বাঙ্ময় কাব্য স্বভাবোক্তি এবং বক্রোক্তি এই দু'ভাগে বিভক্ত। তিনি বক্রোক্তিকে লক্ষণার দ্বারা রচিত অর্থালংকার বলে চিহ্নিত করলেন। সুতরাং দণ্ডীর বক্রোক্তি প্রচলিত অর্থে বক্রোক্তি নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে ভামহ এবং দণ্ডীর কাছে বক্রোক্তির তাৎপর্য ছিল একরকম আর বামন এবং রুদ্রটের কাছে ছিল অন্যরকম।

'বক্রোক্তিজীবিত্ম-এর প্রথম উন্মেষের দ্বিতীয় কারিকায় কুন্তক বলেছিলেন—

"লোকোত্তরচমৎকারকারিবৈচিত্র্যসিদ্ধয়ে।

কাব্যস্যয়মলঙ্কারঃ কোহপ্যপূর্বো বিধীয়তে।।"

প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 'অসামান্যাহ্লাদবিধায়িবিচিত্রভাবসম্পত্তয়ে' অর্থাৎ কাব্যালংকার বলতে কুন্তক যা বুঝতেন সেই অলংকার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল অসামান্য আনন্দদান। পরবর্তী কারিকায় শেষ অংশে বললেন, সর্পবজ্ঞা কাব্যের লক্ষ্য হল অভিজাতদের হৃদয়ে আহ্লাদ বা আনন্দ সৃষ্টি। সুতরাং বক্রতা ব্যবহারের পিছনে রয়েছে সহৃদয়গণের আনন্দসৃষ্টির উদ্দেশ্য। নিতান্ত চারুত্ব সৃষ্টির জন্য নয়, পাঠকচিত্তের রস সৃষ্টির জন্যই কুন্তকাচার্য বক্রোক্তি ব্যবহারের কথা বলেছেন। সপ্তম কারিকার বৃত্তিতে বক্রোক্তি হল শাস্ত্রদিকে শব্দার্থের যে মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার চেয়ে পৃথক। মহিমভট্ট বলেছিলেন বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ মার্গ পরিত্যাগ করে যে অন্যভাবে বলা হয় তাকেই বলে বক্রোক্তি। দশম কারিকায় কুন্তক বলেছেন, বক্রোক্তি হ'ল — 'বৈদগ্ধভঙ্গীভনিতিঃ'। অর্থাৎ বক্রোক্তি হল সেই কবি কৌলিন্যপ্রসিদ্ধ প্রস্থান বর্জন করে গড়ে ওঠা ভণিতি প্রকার। যদৃষ্টং তল্লিখিতং কাব্যকবিতা কুন্তকের মতে, সহৃদয়ের চিত্তে আনন্দ উৎপাদন করে না। অতঃপর যে বক্রোক্তির কারণ কবি ব্যাপার, কুন্তকাচার্য তাকে ছয়ভাগে ভাগ করলেন—

১। বর্ণবিন্যাস বক্রতা

২। পদপূর্বার্ধ বক্রতা

৩। বাক্য বক্রতা

৪। প্রত্যয়াশ্রয় বক্রতা

৫। প্রকরণ বক্রতা

৬। প্রবন্ধ বক্রতা

প্রথম শ্রেণির বক্রতা নির্ভর করে বর্ণের বিন্যাসের উপর। এই শ্রেণির বক্রতার দ্বারা অনুপ্রাস ও যমক অলংকার সৃষ্টি হয়। সমার্থক শব্দ, রূঢ় শব্দ, কল্পনা-নির্ভর সাদৃশ্যবোধক শব্দ, বিশেষণ, সংবৃত্তি, বৃত্তি (সমাসবদ্ধ,

তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ), ভাব, লিঙ্গ, ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় পদপূর্বার্ধবক্রতা ; কাল, কারক, সংখ্যা, পুরুষ, বাচ্য এবং অব্যয় প্রভৃতির দ্বারা গড়া হয় প্রত্যয়াশ্রয় বা পদপরার্ধবক্রতা। বাক্যবক্রতার কোনো শ্রেণি নেই। রসবৎ, প্রেয়স প্রভৃতি যে সব অলংকার মুখ্যত রসসৃষ্টি করে তাদের দ্বারা বাক্যবক্রতা সৃষ্টি হয়। প্রকরণ বক্রতা এবং প্রবন্ধ বক্রতা আলোচনা করে কুন্তক জানিয়েছেন প্রবন্ধ বক্রতা রয়েছে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে।

কুন্তকাচার্য দশম শতকের মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতকের মধ্যভাগের যে কোনো সময়ে আবির্ভূত হয়ে 'বক্রোক্তি জীবিতম্' রচনা করেছিলেন। তিনি বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলে দাবি করেন। অবশ্য তাঁর অনেক আগেই বামন কাব্যাত্মার সন্ধান করে জানিয়েছেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। সুতরাং শব্দ ও অর্থের দ্বারা গঠিত কাব্যদেহের স্বরূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়ে ভারতীয় আলংকারিকেরা একসময় কাব্যত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্রতী হন। রীতি, ধ্বনি এবং রসকে আলংকারিকেরা বিভিন্ন সময়ে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাদের পথেই অগ্রসর হয়ে কুন্তকও একসময় বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

১৭.১১ সারাংশ

কাব্যের উদ্দেশ্য যদি হয় পাঠকচিত্তে আনন্দদান, তাহলে সেই কাব্যকে অলংকার, ধ্বনি প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর করে তুলতে হয়। সাধারণ কথা যেহেতু সাহিত্য নয়, সেজন্যই কবিরা বিশেষ ভঙ্গিভনিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। বক্রোক্তি যদি কাব্যের প্রাণ নাও হয়, তথাপি কাব্য রসসৃষ্টিতে বক্রোক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তা বোঝা যায় যখন জীবনানন্দ দাশ চাঁদের রং বোঝাতে 'নীলকস্তুরী' ব্যবহার করেন। অথবা নায়িকার ব্যাথিত চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন 'নীলাভ বেতের ফলের মতো' তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই সমস্ত কথা অলংকৃত বাক্ বিন্যাস। সুতরাং কবির কথা যে সাধারণ কথা থেকে পৃথক 'বিশেষভঙ্গীভণিতি' বিশিষ্ট তাতো বলাই বাহুল্য।

১৭.১২ অনুশীলনী-৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

১। 'বক্রোক্তিজীবিতম্' কার রচনা ? তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?

২। বক্রোক্তিকে শব্দালংকার বলে মনে করেছিলেন কারা ? তাঁরা বক্রোক্তির কয়টি বিভাগের কথা বলেছিলেন এবং কী কী ?

৩। কুন্তক বক্রোক্তি বলতে কী বুঝতেন ?

৪। কুন্তক বক্তোক্তিকে কয় ভাগে ভাগ করলেন এবং কী কী ?

৫। 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' বলতে কী বোঝায় ?

৬। কুন্তকের কাছে বক্রোক্তি কেন কাব্যপ্রাণ—আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৭। কাব্যের উদ্দেশ্য কী ? আলোচনা করুন।

১৭.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। কাব্যজিজ্ঞাসা - শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

২। কাব্যালোক - শ্রী সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

৩। ভরতের নাট্যশাস্ত্র; অনু: গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

৪। আনন্দবর্ধনের ধন্যালোকঃ অনুবাদ

৫। সাহিত্যবিবেক ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। সাহিত্যবিচার—ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৭। সাহিত্য পাঠের ভূমিকা - বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য